Soheli by Suchitra Bhattaycharya

For More Books & Muzic Visit www.MurchOna.com

suman_ahm@yahoo.com

.....www.MurchOna.com.....

সহেলি

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

কতকাল পর যে দেখা হল সহেলির সঙ্গে! তাও কিনা কলকাতায় নয়, দিল্লি মুম্বাই চেন্নাই ব্যাংগালোর ভূ-ভারতের কোথ্থাও নয়, সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পেরিয়ে এসে এই সুদূর আমেরিকায়! নাহ্, পৃথিবীটা সত্যিই গোল।

হাতের কফির কাপ প্রায় চলকে যাচ্ছিল, বিস্মিত মুখে বললাম– তুই? তুই এখানে?

সহেলি মুচকি মুচকি হাসছে – আমি তো এখানেই থাকি। আমি তো এখন আটলান্টারই বাসিন্দা।

– তাআই? কবে এলি এদেশে?

– অনেককাল। সহেলি মুহূর্ত ভাবল – তা নয় নয় করে তো প্রায় দশ বছর কেটে গেল।

– বলিস কী রে? আমি তো জানতাম তোরা দিল্লির ওদিকে আছিস! মৈনাক কোন বড় কোম্পানীতে চাকরি পেয়ে নয়ডা চলে গেছে .....!

– নয়ডা নয়, গাজিয়াবাদ। ওখানে বছর তিন চার থাকার পরেই তো ...

– ও। মনটা সামান্য উদাস হয়ে গেল– কী কান্ড দ্যাখ্, বন্ধু-বান্ধবদের কোনও খবরই আর পাই না।

– পাস না? নাকি রাখিস না? সহেলি চোখ টিপল– তুই এখন কত বিখ্যাত হয়ে গেছিস, আমরা সব এলেবেলে বন্ধু ....

– যাহ্, কী যে বলিস! ছিলাম পুঁটিমাছ, হয়েছি মৌরলা। সাইজ যা ছিল তাইই আছে। বাজারে সামান্য একটু ভাও বেড়েছে, এই যা।

– খুব বিনয় হচ্ছে, অ্যাঁ? তোর কণ্ঠসুধা পান করার জন্য আটলান্টার বাঙালিরা কী রকম হা-পিত্যেশ করে বসে ছিল জানিস?

এমন স্তুতি কার না ভাল লাগে? তবে আমার কান এখন এ ধরনের প্রশস্তিতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। আবৃত্তিকার হিসেবে দু'বাংলা জুড়ে আমার আজকাল যথেষ্ট নামডাক। হিল্লি দিল্লি বহু জায়গা থেকেই অনুষ্ঠানের জন্য আমন্ত্রণ আসে ঘন ঘন। এবার আমেরিকাতে উড়ে আসাও ওই আবৃত্তির সুবাদেই। এসে দেখছি এই আটলান্টাতেও আমার ভক্তের সংখ্যা নেহাত কম নয়। অজস্র অটোগ্রাফ বিলোতে হচ্ছে, স্টলেও হু হু করে

ক্যাসেট বিক্রি হচ্ছে আমার। এই তো, এই মাত্র প্রোগ্রাম শেষ করে স্টেজ থেকে নামতেই প্রায় মব্‌ড হওয়ার উপক্রম।
তবু ছোটবেলার বন্ধুর মুখে প্রশংসা শুনতে একটু তো লজ্জা করেই। প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে বললাম– মনে আছে, আমাদের কবে লাস্ট দেখা হয়েছিল?
– নেই আবার! সেই যে, রাকার বিয়েতে। .... কত বছর হল বল্‌ তো?
– তা পনেরো ষোল তো হবেই।
– সত্যি, দিন যায়, না ঝড় যায়! মনে আছে, বন্ধুরা মিলে কী হুল্লোড় করেছিলাম সেদিন? সারা রাত বাসর জাগা হল ...!
– দারুণ জমেছিল। তোর পুঁচকেটাও আমাদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে .....
– সে আর মোটেই পুঁচকে নেই। বুবুন এখন রীতিমত ম্যান। কুড়ি বছরের যুবক।
– হুঁ, তা তো হবেই। অডিটোরিয়ামের বাইরে লাউঞ্জ মতন জায়গাটায় ইতস্তত চেয়ার ছড়ানো। একটা চেয়ার টেনে বসলাম আমি– আমার মেয়েই তো দ্যাখ্‌ না দ্যাখ্‌ চৌদ্দ।
– তুই কিন্তু একটা ফাউল করেছিস কাবেরী। সহেলি মুখোমুখি বসল– ফুস করে বিয়েটা সেরে ফেললি, জানালিও না, নেমন্তন্নও করলি না! আমি খবর পেয়েছিলাম জয়ির কাছ থেকে। তাও তোর বিয়ের মাস চার-পাঁচ পর।
– কাউকেই জানাতে পারি নি রে। অপ্রস্তুত মুখে বললাম– এমন হচপচ করে বিয়েটা হয়েছিল!
– হচপচ? মানে খিচুড়ি?
– প্রায় সেরকম। প্রতীক কুমার তখন চুল উড় উড় করে ঘুরে বেড়াতেন, আর দিস্তে দিস্তে কবিতা লিখতেন। নো চাকরি, নো রোজগার। কোন বাপ মা ওরকম ভ্যাগাবন্ড পাত্রর সঙ্গে বিয়ে দিতে রাজি হয় বল্‌? অগত্যা গৃহত্যাগ এবং আইমিন গাঁটছড়া। ঠোঁট টিপে হাসলাম, – পরে অবশ্য বাবা মা মেনে নিল, দিনক্ষণ দেখে নমো নমো অনুষ্ঠানও হল, সাত পাক ঘুরেও নিলাম। এখন তো জামাইকে মা চোখে হারায়। টিভি খুললেই যখন-তখন জামাই-এর মুখ ..... জামাইও খুব দেখভাল করে ....
– তোর বরও টিভি স্টার?
– তুই যেরকম ভাবছিস সেরকম নয়। দূরদর্শনে চাকরি করে। প্রোগ্রাম পোডিউস, প্রোগ্রাম কনডাক্ট .....। প্রতীককে ছোট করা হচ্ছে ভেবে তাড়াতাড়ি কথাটা সামলে নিলাম,
– অবশ্য কবি হিসেবেও প্রতীকের এখন খুব নাম।
– বাহ্‌, বর কবি, বউ আবৃত্তিকার। বউ-এর হাতে মাইক, বরের হাতে মিডিয়া। সহেলি ভ্রূভঙ্গি করল– ফ্যান্টাসটিক জুটি বানিয়েছিস তো! একেবারে মেড ফর ইচ আদার!
ইঙ্গিতটা ভাল লাগ না। আমি যে নিজের জোরেই একটু একটু করে আবৃত্তির জগতে নাম করেছি, একথা লোকজনকে বিশ্বাস করানো যে কঠিন হয় এক এক সময়ে। প্রতীক কোনও দিনই আমার খুঁটি ছিল না, আমিও প্রতীকের সিঁড়ি নই কখনই। পেশাগতভাবে সর্বদা আমরা যে যার জায়গায় থাকি। পরস্পরের পেশাকে সম্মান করি।
তবে এত কথা সহেলিকে বলতে যাব কেন? আলগাভাবে বললাম– আমার কথা বাদ দে। তোর খবর বল্‌। ছেলে কী করছে?
–পড়ছে। কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে।
– ফাংশনে আসে নি?
– নারে। প্রায় উইকএন্ডেই আসে, এ সপ্তাহে পারল না। সামনে সেমিস্টার এগজাম, পড়াশুনোর চাপ আছে খুব।
– আর তোর বর? শ্রীমান মৈনাক?
– আছে তার মতো। নিজের জগতে।
– তার মানে সেও আসেনি?
– হয়তো এসেছে। হয়তো আছে এদিক ওদিক। বলতে পারব না।
কথার সুরে কেমন যেন খটকা লাগল। তবু হালকা চালেই বললাম– এখনও কি মৈনাক সেই আগের মতো

ফক্কড় আছে? বিটকেল বিটকেল জোক্স শোনায়, আর নিজেই হেসে গড়াগড়ি খায়?
– মানুষ কি চিরকাল একরকম থাকে রে? সহেলির মুখ যেন সহসা ম্লান। বিড়বিড় করে বলল– বদলে যায়। মানুষ বদলে যায়।
– মানে?
– মৈনাক নিজেই এখন একটা জ্যান্ত জোক। নিষ্ঠুর ঠাট্টা।
অজান্তেই ভুরু কুচকে গেল আমার। তাও ঠোঁটে একটা হাসি টেনে বললাম– কেন রে, মৈনাক কি এখন খুব কেজো হয়ে গেছে? ধূসর মানব? রামগরুর টাইপ?
সহেলি একটুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর ছোট্ট একটা শ্বাস ফেলে বলল – আমরা আর এক সঙ্গে থাকি না রে।
– সে কী? কেন?
– বনছে না। সহেলি নখ খুঁটছে– আমি ডিভোর্স স্যুট ফাইল করেছি।
স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। বলে কী সহেলি? মৈনাক আর সহেলির প্রেম তো এক সময়ে কিংবদন্তি ছিল! আমরা ঠাট্টা করে বলতাম কিউ ইউ জুটি। সেই সহেলি ডিভোর্স করছে চুয়াল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে? একসঙ্গে এতকাল ঘর করার পর? তাও কিনা এই বিদেশে এসে? প্রায় মধ্য বয়সে পৌঁছে কী এমন গন্ডগোল হল দু'জনের?
ঝপ করে জিজ্ঞেস করতে পারলাম না। একটা বয়সের পর পুরোন বন্ধুর ব্যক্তিগত জীবনে বেশি উঁকি দেওয়া বোধহয় ঠিকও নয়। তাছাড়া আমরা তো আর এখনও সেই প্রথম যৌবনের সখীটি নেই, হুটহাট প্রশ্নবাণ হানতে সংকোচ হতেই পারে। তার ওপর সময়ের পাচিল উঠে গেছে দু'জনের মধ্যে। দীর্ঘ অদর্শনে তৈরি হয়েছে দূরত্ব। সহেলি চুপ মেরে গেছে। আমিও জোর করে কথা বাড়ানোর সুযোগ পেলাম না। আধুনিক গানের অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে এই মাত্র, এবার উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের পালা, ক্ষণিক বিরতি পেয়ে শ্রোতা দর্শক অনেকেই উঠে আসছে অডিটোরিয়াম ছেড়ে। তাদের কেউ কেউ এগিয়ে এল আমার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে। উদ্যোক্তারাও ঘন ঘন আসছে, জিজ্ঞেস করছে আমার কোনও অসুবিধে হচ্ছে কিনা। সহেলিকে ভুলে আত্মসচেতন হয়ে পড়লাম আমি। জবাব দিচ্ছি মেপে মেপে, ঠোঁটে মেখে নিয়েছি যান্ত্রিক ইলাস্টিক হাসি।
তাকিয়ে তাকিয়ে আমেরিকার বাঙালিদেরও দেখছিলাম। প্রত্যেকেই সুসজ্জিত। নারী-পুরুষ অধিকাংশের পরনেই খাঁটি বাঙালি পোশাক। পাজামা-পাঞ্জাবি। ধুতি-পাঞ্জাবি। শাড়ি। কথাও বলছে সবাই নিখাদ বাংলায়। দেখতে মজা লাগে বেশ। প্রবাসে এরা প্রায় সবাই রীতিমত প্রতিষ্ঠিত, পাকাপাকিভাবে হয়তো আর কোনও দিনই দেশে ফিরবে না, তবু শিকড়ের প্রতি একটা টান বুঝি এদের রয়েই গেছে। তারই আকর্ষণে বছর বছর এই জমায়েত। এই বঙ্গসম্মেলন। দেশ থেকে নামি-দামী শিল্পী সাহিত্যিকদের উড়িয়ে আনা। বিদেশে বসেও দেশের মাটির গন্ধ পাওয়ার সৌখিন, কিন্তু কী অকৃত্রিম বাসনা।
সরোদ বাদন আরম্ভ হতেই দ্রুত লাউঞ্জ ফাঁকা। সহেলিও আবার আগের মতোই স্বাভাবিক। ঘড়ি দেখতে দেখতে বলল– ছ'টা বাজল। কী করবি এখন? এখানেই বসে থাকবি?
– তাই তো ভাবছি। আলগা আড়মোড়া ভাঙলাম– হোটেলে ফিরে গেলে হয়। জেটল্যাগ্ কাটে নি এখনও, ঘুম ঘুম পাচ্ছে।
– এখনও জেটল্যাগ? কাল তো সারাদিন পড়ে পড়ে ঘুমিয়েছিস!
– তুই জানলি কী করে?
–কাল অফিস থেকে দু'বার তোর হোটেলে ফোন করেছি। দু'বারই সেম রিপ্লাই– সরি, ম্যাডাম ঘুমোচ্ছেন। ডাকা বারন।
– কী করব বল্? তোদের আমেরিকা কি কম দূর? প্লেনেই তো বসে থাকতে হল আঠারো/কুড়ি ঘণ্টা। কলকাতা থেকে দিল্লি, দিল্লি থেকে আমস্টাড্যাম, সেখান থেকে ডেট্রয়েট, ড্রেয়য়েট থেকে আটলান্টা..... জান একেবারে নিকলে গেছে। বলেই একটু থমকালাম।
– তুই জানতিস আমি কোথায় উঠেছি?
– সম্মেলনের গেস্ট্রা কোথায় থাকবে জানা কি আর এমন কঠিন! তাছাড়া আমার স্পেশাল ইন্টাররেস্টও ছিল। আই মিন তুই। ছটফট করছিলাম কবে তোর সঙ্গে দেখা হবে।

– কালই তাহলে সোজা চলে এলি না কেন হোটেলে?
– হয়ে উঠল না। অফিস থেকে বেরোতে লেট হল .... তাছাড়া সন্ধ্যেবেলা সাড়ে আটটার মধ্যে আমায় বাড়ি ফিরতেই হয়।
– কেন? ওরকম বাঁধা টাইম কেন?
– আছে কারণ। অনেকক্ষণ পর সহেলি মুচকি হাসল– সাড়ে আটটা থেকে ন'টার মধ্যে আমার একটা ফোন আসে। ফোনটায় আমায় অ্যাটেন্ড করতেই হয়।
– কার ফোন?
– আছে একজন। সহেলির ঠোঁটে রহস্যের হাসি– চল্ আমার সঙ্গে। গেলেই দেখতে পাবি।
–এখন তোর বাড়ি যাব?
-অবশ্যই। আমি থাকতে আটলান্টায় এসে তুই হোটেলে স্টে করবি? আমি তো ডিসাইড করেই এসেছি, আজ তোকে হাইজ্যাক করে নিয়ে যাব।
অস্বস্তিতে পড়ে গেলাম। বললাম, যাহ্, তা হয় নাকি? উদ্যোক্তারা এক ধরনের বন্দোবস্ত করেছে, তাদের না বলে-কয়ে হুট করে ...
–কিছু হবে না। এখানে কর্তা বলতে তো রথীন সেন, আমি রথীনদাকে ইন্টিমেট করে দিচ্ছি। বলেই আঁচল গুছিয়ে হনহনিয়ে অডিটোরিয়ামে ঢুকে গেল সহেলি। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই উচ্ছসিত মুখে ফিরে এসেছে, চল্ চল্, হোটেল থেকে তোর লাগেজ তুলে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। এখন থেকে আটলান্টায় তুই আমার কবজায়। উঠে পড়।
এরপর কি আর না বলা যায়? অবশ্য মনে মনে আমার ভালই লাগছিল। এখানে এসে হোটেলবাস মোটেই আমার মনঃপূত হয়নি। জীবনে এই আমার প্রথম বিদেশ সফর, এরা তুলেছেও এক সত্তর তলা জাম্বো হোটেলে, ওখানে থাকা কি আমার পোষায়? তার চেয়ে বন্ধুর বাড়ি ঢের ঢের আরামের।
প্রকাণ্ড এক কম্পাউন্ডের ভূগর্ভে অডিটোরিয়াম। দু-দুবার এসকালেটার চড়ে উঠলাম পৃথিবীতে। বাইরে এসে দাঁড়িয়েছি মুক্তো হাওয়ায়। সামনে প্রশস্ত চাতাল। চাতাল পেরিয়ে রাস্তা। ওপারে অতিকায় হোটেল, পাশে বিশ্বখ্যাত সিএনএনের সদর দপ্তর। সেও এক প্রকাণ্ড বাড়ি। আমেরিকানরা বুঝি কোন কিছুই ছোট বানাতে পারে না।
সহেলি গাড়ি রেখেছে বেশ খানিকটা দূরে। ফুটপাত ধরে হাঁটছি দু'জনে। রাস্তার গায়ে একটা পার্ক পড়ল। এই পার্কেই নাকি আটলান্টা অলিম্পিকের সময়ে বোমা ফেটেছিল, এখন সেখানে কনসার্ট চলছে জোর, উদ্দাম নাচাগানা করছে এক দঙ্গল কৃষ্ণাঙ্গ তরুণ-তরুণী। একেই কি বলে ছবি বদলে যাওয়া? কালো মেয়েদের সাজপোশাকও ভারী মজাদার। প্যান্ট পরেছে না প্যান্টি বোঝা দায়, উর্ধাঙ্গ প্রায় টপলেস। চুলে নানান বর্ণের অজস্র সরু সরু বিনুনি, ফাঁক দিয়ে দিয়ে মাথার খোল দৃশ্যমান। আজ শনিবার, সপ্তাহান্তের ছুটি, বেপরোয়া যৌবন উপচে পড়ছে হাসি আর গানে।
দেখতে দেখতে পা থমকে গিয়েছিল, সহেলি হ্যাঁচকা টান মারল,-কী রে, চল্। বললাম না তোকেসহ সাড়ে আটটার মধ্যে আমায় বাড়ি ফিরতে হয়!
সন্দিগ্ধ চোখে তাকালাম,–কিসের এত তাড়া তোর? সাড়ে আটটায় কোন ভিআইপি ফোন আসে?
চারদিকে এখন এক চমৎকার বিকেল। সূর্য এখানে পাটে যায় প্রায় রাত নটায়, মনোরম আলোয় ছেয়ে আছে পথ-ঘাট। শেষ বিকেলের সেই আলোতে ক্ষণিকের জন্য উদ্ভাসিত হল সহেলির মুখখানা। তারপরই কেমন ছায়া মাখা গলায় বলল,–ছেলেটা ওই সময়ে রোজ একবার করে ফোন করে রে। বুবুনই এখন আমার ভিআইপি। আমার একমাত্র সম্বল। শুধু ওর জন্যই না এখন আমার বেঁচে থাকা।

ছোট্ট কটেজ টাইপ বাড়ি। সামনে এক ফালি সবুজ লন। আর পাঁচটা বাড়ির মতোই তেকোণা ছাদের ঢালে কালচে মেরুন টালি, প্যারাপেট ভেদ করে মাথা তুলে আছে খান দু'তিন চিমনি। মসৃণ ড্রাইভওয়েটা সামান্য চড়াই, রাস্তা থেকে সোজা উঠে গেছে গ্যারেজে। ঠিক যেন ইংরিজি ছবির দৃশ্য।
ঝকঝকে লেক্সাস গাড়ির ড্রাইভিং সিটে বসে রিমোট টিপল সহেলি, সরসর উঠে গেল গ্যারেজের শাঁটার।

ভেতরে গাড়ি ঢুকিয়ে সিটবেল্ট খুলতে খুলতে বলল,-দাঁড়া, আমি আগে নেমে আলো-টালো জ্বালাই।
অন্ধকার নামব নামব করছে। গ্যারেজের ভেতরটায় আবছায়া। লাইট জ্বলতেই নজরে পড়ল বিস্তর মালপত্র ছড়ানো রয়েছে গ্যারেজে। বড় একখানা টেবিল, একটা কাঠের আলমারি দুতিনটে বেঁটে বেঁটে চেয়ার...
গাড়ি থেকে নেমে বললাম– গ্যারেজে এত ফার্নিচার রেখেছিস যে বড়? রিমডেলিং করাচ্ছিস?
সহেলি কাজে ব্যস্ত। গাড়ির পিছনের দরজা খুলে আমার লটবহর নামাচ্ছে। অবলীলায় দু'খানা ওজনদার স্যুটকেস দু'হাতে তুলে নিয়ে বলল, –ওগুলো মৈনাকের মাল। ঘর থেকে দূর করে দিয়েছি।... তুই আমার পিছু পিছু আয়। আমি আগে বার্গলারি অ্যালার্মটা অফ করছি।
মৈনাকের আসবাব বার করে দেওয়া আর বার্গলারি অ্যালার্ম অফ করা, দুটোই যেন সহেলির কাছে নেহাতই তুচ্ছ সাংসারিক খুঁটিনাটি। অবাক হয়ে দেখছিলাম সহেলিকে। যত দেখছি তত চমকিত হচ্ছি। কত বদলে গেছে মেয়েটা! আগে কী নাজুক নাজুক ছিল, ভীতু ভীতু, আর এখন রীতিমত হাট্টাকাট্টা বীরঙ্গনা। কেমন সাবলীল ভঙ্গিতে চালিয়ে নিয়ে এল প্রকান্ড গাড়িখানা, স্পিডোমিটারে কাঁটা তো মাঝে মাঝেই আশি নব্বই মাইল ছুইছুঁই। গ্যাসস্টেশনে ঢুকে গোবদা নজলখানা ধরে দিব্যি তেল ভরে নিল গাড়িতে, ঝড়ের মতো আমায় উড়িয়ে নিয়ে এল শহরের অন্য প্রান্তে। নাহ্, এই সহেলি আমার একান্ত অচেনা।
বাড়িতে ঢোকা মাত্র আরও বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়ল সহেলি। কিছুতেই আমার হাত লাগাতে দেবে না, টেনে টেনে আমার স্যুটকেস দুখানা ঘরে ঢোকাল, একবার টয়লেটে ঢুকে আমার জন্য তোয়ালে সাবান বার করছে, একবার দৌড়াচ্ছে কিচেনে কফির পানি বসাতে। তার ছোটাছুটি যেন চঞ্চল কাঠবিড়ালিকেও হার মানায়।
ঘুরে ঘুরে বাড়িখানা দেখছিলাম। নরম কার্পেটে মোড়া মেঝে, ওক কাঠের দেওয়াল, ঘরগুলো তেমন বড় নয় বটে, তবে ছিমছাম সাজানো, ড্রয়িং রুমখানা তো রীতিমত নয়নলোভন। কোণায় কোণায় কাগজের ফুলের চমৎকার ঝাড়, দেওয়াল বেয়ে লতিয়ে উঠেছে পাতাবাহার, শোকেসে চমৎকার সব কিউরিও, শরীর ডুবিয়ে দেওয়া সোফা, সুদৃশ্য সেন্টার টেবিল...। সোকেশের মাথায় ছেলের ছবিও রয়েছে। ফ্রেমে বাঁধানো। নানান বয়সের। মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে বুবুন, একা বুবুন, হাস্যমুখ বুবুন...। মৈনাক কোথ্থাও নেই।
সহেলির গোটা বাড়ি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। বাইরে যথেষ্ট গরম আছে, কিন্তু ভেতরটায় বেশ হিম হিম ভাব। আমার শীত শীত করছিল। পা গুড়িয়ে বসলাম সোফায়। ভাবছি। বাড়িটা বড্ড নিঝুম, এমন একটা ফাঁকা বাড়িতে সহেলি একা একা থাকে কী করে?
সহেলি কফি নিয়ে এসেছে। ধুমায়িত কাপ হাতে ধরিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, –কী রে, কেমন দেখছিস আমার সংসার?
–মার্ভেলাস।
–তোর অসুবিধে হবে না তো?
–কিসের অসুবিধে?
–না মানে... অমন রাজকীয় হোটেল ছেড়ে এলি...
–দুস, অত কেতার হোটেলে বাস আমার পোষায় না। কফির পেয়ালায় বড়সড় চুমুক দিলাম, জানিস, পরশু রাত্তিরে আমার একটা বিশ্রী আনক্যানি ফিলিং হচ্ছিল। দেখলি তো রুমটা...ছাপ্পান্ন তলায়। এসেই জানলার পরদা একবার সরিয়ে ছিলাম... চারদিকে আলোর রোসনাই দেখতে বেশ লাগছিল..... হঠাৎ নিচের দিকে চোখ পড়তেই...ইস, কী অতল খাদ! সঙ্গে সঙ্গে গা শিরশির করে উঠেছে, ভোঁ ভোঁ করছে মাথা। সারারাত খালি মনে হচ্ছিল, এত উঁচুতে আছি? যদি এক্ষুণি পড়ে যাই?
–এ দেশে বাস করলে ওই অনুভূতিটা সারাক্ষণই বয়ে বেড়াতে হয় রে।
–কেন?
সহেলি কী একটা যেন উত্তর দিতে যাচ্ছিল, তখনই টেলিফোনের ঝনঝন। দৌড়ে গিয়ে ফোন তুলল সহেলি, রিসিভারে হাত চেপে বলল, টায়ার্ড লাগলে ঘরে গিয়ে একটু শুয়ে নে। টয়লেটে গিয়ে ফ্রেশ হয়েও আসতে পারিস।
উঠতে ইচ্ছে করছিল না। সোফায় হেলান দিয়ে চোখ বুজলাম। মা-ছেলের সংলাপের টুকরো টুকরো অংশ কানে আসছিল। বুবুনের সারাদিনের কর্মকান্ডের বিবরণ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জেনে নিচ্ছে সহেলি। কী খেয়েছে ছেলে,

কী কী করল আজ...। ব্যাংক থেকে টাকা-পয়সা তোলা নিয়েও কী যেন পরামর্শ দিল বুবুনকে। আমার গল্পও শোনাচ্ছে সবিস্তারে। বুবুনও কী যেন জিজ্ঞেস করল, হু হ্যাঁ করে জবাব দিল সহেলি।
কথা শেষ করে বসে আছে ঝুম হয়ে। খানিক পরে আপন মনেই বলে উঠল, ছেলেটার জন্য আমার খুব কষ্ট হয় রে।
-হুম, তা তো হবেই। মাথা দোলালাম,–ছেলে ছেড়ে এভাবে একা থাকা...
–আমার কথা ভেবে বলছি না রে। বুবুনের কথা বলছি। আমাকে নিয়ে সবসময়ে এত দুশ্চিন্তা করে ছেলেটা। এই তো জিজ্ঞেস করছিল, বাবা আজ সম্মেলনে এসেছিল কিনা, আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে কিনা... সর্বক্ষণই আতঙ্ক, এই বুঝি মৈনাক আমায় কোনও অপমান করল... চোখের সামনে দেখেছে তো, আমাকে কী যন্ত্রনাটাই না সহ্য করতে হয়েছে। সহেলি নাক টানল,
–সব থেকে কী খারাপ লাগে জানিস? বাবাকে ও এখন মনে-প্রাণে ঘেন্না করে, অথচ ওই বাবা কদিন আগেও ওর প্রাণ ছিল। সবচেয়ে প্রিয় মানুষের পতন দেখলে এই বয়সের ছেলের কী সাংঘাতিক রিঅ্যাকশন হতে পারে তুই ভাব। কতটা অপমান, কতটা লজ্জা...
সহেলির গলা ধরে এসেছে। উঠে গিয়ে পাশে বসলাম। হাত রেখেছি পিঠে, –কী হয়েছিলটা কী তোদের? কেন এমন হয়ে গেল?
–সে এক লম্বা কাহিনী। কোত্থেকে যে শুরু করি! সহেলি গলা ঝাড়ল, –গত বছরের আগের বছর আমি আর বুবুন দেশে গিয়েছিলাম। মাস খানেকের জন্য। মার শরীরটা খারাপ হয়েছিল, প্লাস দিদির মেয়েটারও বিয়ে ছিল...। মৈনাক কিছুতেই গেল না, ওর অফিসে নাকি ভয়ংকর চাপ, কিছুতেই ছুটি নেওয়া যাবে না। ফিরে এসেও প্রথমটা কিছু বুঝতে পারিনি, হঠাৎ একসময়ে নজরে পড়ল মৈনাক যেন কেমন বদলে গেছে। অফিস থেকে অনেক রাত করে বাড়ি ফেরে, উইকএন্ডে উদ্ভট কোনও অছিলায় দুমদাম ভ্যানিশ করে যায়, ড্রিংকের মাত্রাটাও বেড়ে গেছে, কাছে আসতে চায় না, আদর করতে গেলে বিরক্ত হয়...। কী রকম যেন একটা বিপদের গন্ধ পাচ্ছিলাম। একদিন ভাল করে চেপে ধরতেই চড়াং করে রেগে গেল। হুড়হুড় করে বলে দিল সে এখন অন্য এক মহিলাকে ভালবাসে, তাকে ছাড়া কিছুতেই থাকতে পারবে না, আমি যেন ওকে কোনওভাবে বোর না করি। শুনেতো আমার মাথায় বজ্রাঘাত। খুব কান্নাকাটি করেছিলাম দেখে বুজি ওর করুণা হল। সমঝোতা করে বলল, অ্যাফেয়ার যখন একটা হয়েই গেছে, এখন তো আর উপায় নেই, একটু সময় দাও, আস্তে আস্তে সরে আসব। আমি কী নির্বোধ ভাব, কথাটা বিশ্বাসও করে ফেললাম। মাস তিন চার পর আবিষ্কার করলাম সবই চালিয়ে যাচ্ছে। লুকিয়ে চুরিয়ে। তারপর তো আর লুকোচুরিটাও রইল না। সেই মহিলার বাড়িতেই পড়ে থাকে দিনরাত, সারাক্ষণ মদে চুর...আমি আর বুবুন গিয়ে কতদিন রাতবিরেতে ওই মহিলার বাড়ির থেকে গিয়ে তুলে এনেছি মৈনাককে। শেষ ঘা'টা দিল গত ডিসেম্বরে। হঠাৎ একদিন দুপুরবেলা আমার অফিসে ফোন, আমি আর চন্দ্রা কন্টিনেন্ট ট্যুরে যাচ্ছি, অনর্থক উতলা হোয়ো না, মাস দুয়েক পরে ফিরব। ভাব্ ভাব্, ভাব্ তুই ইনসাল্টটা! তখনও টের পাইনি আরও কত বড় সর্বনাশটা করে গেছে।
আমার মুখে কথা সরছিল না। এর পরও সর্বনাশের বাকি থাকে? অস্ফুটে বললাম?
–কী করেছে?
–আমাকে নিঃস্ব করে দিয়ে গেছে। নেক্সট উইকে ব্যাংকে গিয়ে আবিষ্কার করলাম আমাদের জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট একেবারে শূন্য, আমাদের জমানো সর্বস্ব তুলে নিয়ে গেছে যাওয়ার সময়। ঠিক তখনই বুবুনের ফিস দিতে হবে ইউনিভার্সিটিতে...জানিস তো এখানে হায়ার এডুকেশন মানে হাতির খরচ। তার ওপর এই বাড়ির দেনা, গাড়ির লোন...। ফিরে এসে শয়তানটা এ বাড়ীর ছায়া মাড়াল না, সোজা উঠল গিয়ে মহিলার ডেরায়। তুই বল, এরপর কোন মেয়ে মানুষ তার সঙ্গে সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে চাইবে। কী সাংঘাতিক লোক ভাব, নিজে ছেলেটার কথাও একবার চিন্তা করল না। সমস্ত দায়দায়িত্ব টোকা মেরে ঝেড়ে ফেলে দিল।
এর উত্তরে কী বলব আমি? পাথরের মতো বসে আছি। মৈনাকের মুখটা মনে করার চেষ্টা করছিলাম। কলেজে পড়ার সময়ে সহেলির জন্য কী পাগলটাই না ছিল। ইঞ্জিনিয়ারিং- এর ক্লাস ছেড়ে এসে ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করত করিডরে, একদিন সহেলির দেখা না পেলে ছটফট করত। বিয়ের পরেও তো দু'জনে দিব্যি কপোত-কপোতী হয়েছিল, সহেলিকে তখনও তো চোখে হারাত মৈনাক। মধ্যবয়সে এসে সেই মৈনাকের এ কী

For More Books & Muzic Visit www.MurchOna.com

ভীমরতি?
গুমগুমে গলায় জিজ্ঞেস করলাম, –তা এই চন্দা নামক মহিলাটি কে? কোথ্ থেকে উদয় হল?
আটলান্টাতেই থাকে। এক ডাক্তারের বউ।
–ম্যারেড?
–ম্যারেড মানে! বুবুনের চেয়ে বছর দু'য়েকের ছোট একটা মেয়ে আছে। বর থাকে রুগী নিয়ে, আর উনি সারাদিন নস্টামি করে বেড়ান।
–ডাক্তার জানে না? টের পায় না?
–ডাক্তার জানে না? টের পাইনা।
– এ-টু জেড জানে। আমি নিজে ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি আমেরিকানদের চেয়েও আমেরিকান। স্ট্রেট বলে দিলেন, আমি আমার স্ত্রীর ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করি না। আদতে বুঝলি না, একদম স্পাইনলেস ফেলো। নইলে বউ তার প্রেমিককে ঘরে পুষে রাখছে, তার সঙ্গে প্যারিস সুইজারল্যান্ড বেড়াতে যাচ্ছে, এটা কোনও পুরুষ সোয়ালো করতে পারে।
–একসঙ্গে থাকে? আমার চক্ষু চড়কগাছ, তিন জনে?
–তিন জন নয়, চার। মহিলার মেয়েটাকেও ধর। এরা যে কী স্তরের জীব ঈশ্বরই জানেন। কুকুর-বেড়ালদের সমাজেও বোধহয় এতটা বাড়াবাড়ি চলে না।
মনে মনে ছবিটা কল্পনা করার চেষ্টা করলাম। মেয়ের সামনে বাবাকে টাটা করে প্রেমিকের গলা জড়িয়ে শয়নকক্ষে ঢুকে যাচ্ছে মা! সকালবেলা তুড়ি মেরে হাই তুলতে তুলতে ঘর থেকে বিরিয়ে এল প্রেমিক, দুই পুরুষ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দাঁত ব্রাশ করছে! একগাল হেসে দু'জন দু'জনকে বলছে, হাই, গুডমর্নিং! হাউ ইজ লাইফ! ব্রেকফাস্ট টেবিলে মার প্রেমিককে কলা স্যান্ডুইচ এগিয়ে দিল মেয়ে, লাদেন-বুশ নিয়ে গুরুগম্ভীর আলোচনায় মেতে উঠল দুই পুরুষ! কাজে বেরানোর সময়ে দু'দিক থেকে মহিলার দু'গালে ঠোঁট ছোঁয়াছে দু'জন! কলিযুগ পার হয়ে আবার কি সত্য যুগ ফিরে এল? হিংসে, অধিকারবোধ, সবই কি মুছে গেল পৃথিবী থেকে? পিত্তি জ্বলে যাচ্ছে হাসিও পাচ্ছে। জিজ্ঞেস করলাম, মহিলাকে দেখতে কেমন?
–রূপের ধুচুনি। আলগা একটা চটক আছে, ঢং করে কথা বলে, ড্রিংক করে নাচতে পারে, যত্রতত্র শুয়ে পড়তে পারে...
–বুঝেছি। ঢলানি। এসব মহিলাকে চাবকে সিধে করতে হয়।
–কে চাবকাবে? ওই মেনিমুখো বরটা? আমার স্থির বিশ্বাস, মেয়েটাও ওই লোকটার নয়। শিওর কোনও মজনুর ইশ্‌কের বাইপ্রোডাক্ট।
–হ্যাঁ, হ্যাঁ, ডাক্তারটা নির্ঘাৎ ইম্পোটেন্ট। সেই জন্যই বউকে মার্কেটে ছেড়ে দিয়েছে।
–হয়তো। সহেলি শ্বাস ফেলল, কিন্তু আমার সংসারটা তো ছারখার হয়ে গেল। বুবুন যে বুবুন, সেও মৈনাককে কত বুঝিয়েছে, বাবা এরকম করে না, সুস্থ জীবনে ফিরে এসো...। কে শোনে কার কথা! ওই মহিলা কি যে জাদু করল... আমার যে কী নেই...
সহেলির স্বর ক্রমশ ডুবে গেল। আমিও নীরব। বাতাবরণে চারিয়ে যাচ্ছে বিষণ্ণতা। ঠাণ্ডাটাও যেন বেড়ে গেছে হঠাৎ। ঘরের উজ্জ্বল বাতি সহসা ম্রিয়মাণ। নৈঃশব্দ্যের চাপে কুঁজো হয়ে গেছে সহেলি, দু'আঙ্গুলে রগ টিপছে। নত মুখে।
দেওয়ালের মিউজিকাল ঘড়িতে সুর করে দশটা বাজল। চাইমস শুনে সহেলি চমকে তাকিয়েছে। তড়াক করে উঠে দাঁড়াল। অপ্রস্তুত হেসে বলল, ত্যাৎ সব যত ফালতু কথা বলে সময় নষ্ট করলাম। রাতে কী খাবি বল? চটপট রান্না চড়িয়ে দি। ভার মুখে বললাম, কিছু করতে হবে না।
–সে কী রে? খাবি না?
–একটু সেদ্ধভাত বসিয়ে দে।
–আহা, তাই হয় নাকি? তোকে গ্র্যান্ড ডিনার থেকে তুলে নিয়ে এলাম। তাছাড়া ওসব নিয়ে আর কেন মন খারাপ করব বল? সম্পর্কটা তো চুকিয়েই দিচ্ছি। সহেলি আবার আগের মতো স্বচ্ছন্দ, স্বাভাবিক। হাত ধরে টানছে আমায়, আয় আয়, ফ্রিজ খুলে পছন্দ কর কোন মাছটা খাবি।

সহেলির কিচেনটা বিশাল। সেখানে কি আছে আর কী নেই। ফ্রিজ, কুকিং রেঞ্জ, ডিশওয়াসার, মাইক্রো ওভেন, ওয়াশিং মেশিন...। সব কিছু রেখেও কতখানি ফাঁকা জায়গা, ডাইনিং টেবিলও পড়ে গেছে এক ধারে। ফ্রিজের সাইজ জাম্বো বললেও কম বলা হয়, ভেতরে রাশি রাশি খাদ্য উপচে পড়ছে। ডিম, মাখন, চিজ এমনকি আচার পর্যন্ত সাজানো থরে থরে। ডিঙি মেরে ডিপ ফ্রিজ খুলে সহেলি চার-পাঁচটা প্যাকেজ বের করে বলল, নে, চুজ কর কোন মাছটা খাবি। এটা চিংড়ি, এটা পাবদা, এটা ক্যাটফিস, এটা স্যামন... তোর জন্য বাংলাদেশের ইলিশও খুঁজেছিলাম, পাইনি। কাল ফের একটা ড্রাইভ নেব।

করেছিস কি? আমার চোখ ছানাবড়া, মাছের বাজার বসিয়ে দিয়েছিস যে! পাবদার কী সাইজ, বাপস! আমেরিকায় এত বড় বড় পাবদা পাওয়া যায়?

হুঁ হুঁ বাবা, এ হল সব পেয়েছির দেশ। দুনিয়ার সমস্ত সেরা জিনিস আগে এখানে চালান হয়ে আসে। এই টাইগার প্রাণগুলো কোথাকার বলতো? ফ্রম বসিরহাট। পাবদাও হয়তো দ্যাখ ক্যানিং-এর।

–এতদ্দুর এসে ক্যানিং বসিরহাটের মাছা খাব? খোদ আমেরিকার কিছু নেই?

–বাফেলো চলবে/এখানকার রুই? কিম্বা ক্যাটফিশ? অবিকল মাগুরের মতো খেতে। গরগরে করে রান্না করলে যা দারুণ লাগে না!

–কর না যা হোক কিছু। তবে অল্প করে। হাত লাগাব তোর সঙ্গে?

–ইল্লিরে, বর ছেড়েছি বলে কিচেনের অধিকারও ছেড়ে দেব? সহেলি খিলখিল হেসে উঠল, তুই যা, ড্রেস-টেসগুলো বদলে নে, কম্ফর্টেবল ফিল করবি।

সহেলির গালে আলগা টোকা মেরে বুবুনের ঘরটায় এলাম। এ ঘরেই আমার মালপত্র রেখেছে সহেলি। দেয়ালে অজস্র পোস্টার। বাস্কেটবল প্লেয়ার, রকস্টার, বেসবলের দৃশ্য। একটা মুখও চিনি না। এদিকে ওদিকেও বুবুনের জিনিস ছড়ানো। স্টিরিও ওয়াকম্যান কম্পিউটার ...। একটা পুরুষ পুরুষ গন্ধও যেন বিছিয়ে আছে গোটা ঘরে। বুবুনকে কত ছোট্টটি দেখিছিলাম। তেতো অভিজ্ঞতার আগুনে ঝলসে ছেলেটা নিশ্চয়ই বয়সের থেকেও বেশি বড় হয়ে গেছে। অন্তত সহেলির কথা শুনে তো তাই মনে হয় আহারে বুবুন।

হঠাৎ বুকটা ছ্যাৎ করে উঠেছে। এমন ঘটনা যদি ঝুমের জীবনেও ঘটে? আমাদেরও তো তিনজনের নিটোল সংসার, সেখানে যদি কোনও উটকো আপদ এসে হাজির হয়? উহু! প্রতীক মৈনাক নয়, সে কখনো এমন করবে না। তবু যেন ভাবনাটায় তেমন জোর পেলাম না। যাকে মানুষ সুখের সংসার ভেবে তৃপ্তি বোধ করে, নিয়তির একটা টোকায় সে সংসারের চেহারা বদলে যেতে কতক্ষণ? সহেলি কি স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিল মৈনাক এমন আঘাতটা হানবে?

এলোমেলো চিন্তার মাঝে স্যুটকেশ খুললাম। নাইটি কাঁধে ঢুকেছি টয়লেটে। মুখে জল ছেটাতে ছেটাতে ঝুম আর প্রতীকের কথাই ভাবছিলাম। কী যে করছে মেয়েটা এখন! কলকাতায় তো এখন সকাল। সামার ভেকেশন চলছে, স্কুল যাওয়ার তাড়া নেই, নিশ্চয়ই ঝুম এখনও বিছানা ছাড়েনি। আজ সকালেই হোটেলে থেকে ফোন করেছিলাম ঝুমের গলাটা কেমন ভার ভার শোনাচ্ছিল। মেয়ের কি মন খারাপ? ধুস, ভাল্লাগে না। সব্বাইকে ছেড়ে একা একা এত দূর না এলেই হত। আটলান্টা থেকে নিউজার্সি যাব, ওখানে প্রোগ্রাম করে তবে ফেরা। এখনও প্রায় পনেরো দিন। প্রতীক নিশ্চয়ই হাফ ছেড়ে বেঁচেছে। পেছনে ট্যাকট্যাক করার তো কেউ নেই, নিশ্চয়ই ঘোর অনিয়ম করবে ক'দিন। বেরিয়েই বুবুনের কম্পিউটার থেকে একটা ই-মেল পাঠাতে হবে ঝুমকে, মেয়ে যেন বাপাকে টাইটে রাখে।

বেরিয়ে এসে কম্পিউটারেই বসেছি, ওমনি সহেলির ডাক। রান্নাঘরে গিয়ে দেখি ভানুমতির খেল, এইটুকু সময়ে তিন রকম মাছ বানিয়ে ফেলেছে সহেলি। সঙ্গে ডাল, গোশত, ঝিরিঝিরি আলুভাজা। ইয়া ডিশ ভর্তি সালাদ। আঁৎকে উঠে বললাম, এত খাবার? আমি কি রাক্ষুসী নাকি?

যা পারবি খা। বাকিটা রাখা থাকবে। পোস্ত আর সর্ষে চিংড়িটা করাই ছিল, ভাবলাম তোকে একটু টেস্ট করতে দিই।

অগত্যা কী আর করা। সবই চাখছি অল্প অল্প। মসলাপাতি অতি উচ্চমানের, সহেলি রেঁধেছেও অপূর্ব। আঙ্গুল চাটতে চাটতে বললাম, তুই তো খুব গুণের হয়ে গেছিসরে। বিয়ের পরও তো প্রেসার কুকার খুলতে পারতিস না।

–মৈনাকটা তো নানা রকম খেতে ভালবাসে, ওর জন্যই...
–শাবাশ! তুই দেখি একেবারে শরৎচন্দ্রের নায়িকা! থ্রু স্টমাক পুরুষের মন জয় করার অভিযান! কথাটা বলে ফেলেই অস্বস্তি হল। সহেলির মুখ কালচে মেরে গেছে। কথা ঘুরিয়ে বললাম, তোর ছেলে কি খেতে ভালবাসে?
–কচু, কিছু মুখে তোলে না। ভাত, ডাল তো ছুঁয়েই দেখে না। বেঙ্গলি খানা বুবুনের বিলকুল নাপছন্দ।
এতাল-বেতাল কথা বলছি দু'জনে খেতে খেতে। খাওয়ার পরেও। কলেজ লাইফের কথা উঠল, পুরোন বন্ধুদের গল্প, আমার ঘর-সংসারের উপাখ্যান আশ্চর্য... যে কোনও কথাতেই সহেলির স্টিয়ারিং ঘুরে যায়, সেই মৈনাকের দিকে। মৈনাক কী বলত, কি কি করত, কোন কোনটা অপছন্দ ছিল মৈনাকের, এরকম অজস্র হাবিজাবি। আবার একটু খেয়াল হলেই সামলে নিচ্ছে নিজেকে। জোর গলায় বোঝাতে চাইছে, মৈনাককে ও ভুলেই গেছে, কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে গুলোই শুধু জ্বালায়, এই যা।
গল্প করতে করতেই হঠাৎ হুঁশ ফিরেছে সহেলির। লাফিয়ে উঠল, যা যা অনেক রাত হল, এবার শুয়ে পড়। কাল সকালে ব্রেকফাস্ট করেই বেরিয়ে পড়তে হবে।
–সকালে কেন? বঙ্গ সম্মেলন তো কাল বিকেলে। চারটে নাগাদ রওনা দিলেই যথেষ্ট।
–ওমা, ওয়ালমার্ট মল সব ঘুরবি না? কাল তোকে এখানকার সবচেয়ে বড় মলে নিয়ে যাব। জর্জিয়া মল। দোকানগুলো দেখলে চোখ ফেরাতে পারবি না, উইন্ডো শপিং করলেই মন ভরে যায়।
বলতে বলতে বুবুনের ঘরে এসে আমার জন্য বিছানা করছে সহেলি। বালিশ, চাদর সাজাতে সাজাতে চোখ নাচাল একা ঘরে শুতে পারবি তো?
–আহা, হোটেলে তো একা ঘরেই ছিলাম।
–আমার সঙ্গেও লেটে যেতে পারিস, তবে সারারাত ঘুম হবে না। আমি যা নাক ডাকাই। ঠাট্টা জুড়লাম, এই জন্যই মৈনাক কেটে পড়ে নিতো?
সহেলিও হালকা ভাবেই নিল কথাটা। বলল, ওরে নাক তো আমার বিয়ের পর দিন থেকেই ডাকে। আওয়াজটা কি বিশ বছর পরে কানে ঢুকল? মৈনাকের তো তাহলে বলতে হয় গণ্ডারের কান।
হাসিতে কেটে পড়লাম দু'জনে। হাসতে সাসতেই চলে গেল সহেলি।
শুয়েও আমার ঘুম আসছিল না। কলকাতা এখন দুপুরে পা রাখছে, আমার বায়োক্লক এখনও আটলান্টায় রপ্ত হয়নি, ডাকলেই বা নিদ্রাদেবী আসবেন কেন! খানিকক্ষণ এ পাশ-ওপাশ করে উঠে পড়লাম। তেষ্টা পাচ্ছে। কিচেন থেকে জল খেয়ে এসে সহেলির ঘরের সামনে দাঁড়ালাম একটু। কান পাতলাম দরজায়। নাসিকাগর্জন শুরু হয়েছে কি?
উহ্, কোন শব্দ নেই। সহেলি কি ঘুমোয় নি এখনও? মৃদু ঠেললাম দরজাটা। ঘরে নীল রাতবাতি, স্বপ্ন স্বপ্ন পরিবেশ। বিছানায় চোখ পড়তেই ...! ডাবলবেড, খাটে সহেলি পাশ ফিরে শুয়ে। বিছানায় মৈনাক নেই, কিন্তু মৈনাকের বালিশটি রাখা! স্বস্থানে! সহেলির হাত আঁকড়ে আছে বালিশটাকে। আমার বুকটা মুচড়ে উঠল।

পরদিন বঙ্গ সম্মেলনে পৌঁছতে প্রায় ছ'টা বেজে গেল। সকাল থেকে প্রচুর হুটোপুটি হয়েছে। এ দোকান ও দোকান, এ বাজার সে বাজার। জর্জিয়া মল ঘুরতেই তো আমার কোমর ব্যথা হয়ে গেল। তাও বেরোতে ইচ্ছে , 'করছিল না, মনে হচ্ছিল আরও দেখি। দোকানগুলোর কী বাহার, চোখ ফেরানো যায় না। যেমন বিশাল, তেমন বর্ণাঢ্য। ঘুমের জন্য দু-দুখানা ড্রেস কিনে ফেললাম, প্রতীকের জন্য চমৎকার একটা ঘড়ি। সহেলি জোর করে আমায় একটা দামি পারফিউম কিনে দিল, ঝুমের জন্য একগাদা কসমেটিকস।
তবে আমায় সব থেকে বেশি টেনেছে ডলার শপগুলো। এ যেন নিলামওয়ালা ছ'আনা, যা নেবে তাই এক ডলার। কত যে টুকিটাকি জিনিস এক ডলারে মিলে যায়। দেশে ফিরে অনেককে উপহার বিলোতে হবে, ডলারট্রির চেয়ে সস্তায় এ দেশে আর কোথায় কী মিলবে! লোভে পড়ে সাবানই কিনে ফেললাম দু'ডজন, লিপস্টিক, নেলপলিশ আর ছোটখাটো খেলনায় ভরিয়ে ফেললাম ব্যাগ।
তাও দাম মেটাতে দিয়ে গা কিশকিশ করছিল। এক ডলার মানে প্রায় পঞ্চাশ টাকা! কলকাতার হিসাবে নেহায়েত কম নয়। আমার মুখভাব দেখে সহেলির কী ফিকফিক হাসি, ওরে বুদ্ধু ওভাবে হিসাব কষিস না। এদেশে আমরা ডলারকেই টাকা বলি। ভেবে দ্যাখ, কলকাতায় মাত্র এক টাকায় এখন চিজ জুটবে কিনা।

বাজার-টাজার সেরে মেক্সিকান রেস্তোরাঁয় টাকু স্যালাড আর চিমি চাংগা সাঁটিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসা। দুজনেই হাঁপাচ্ছি রীতিমত। অডিটোরিয়ামে যাওয়ার জন্য এসকালেটার ধরে নামছি, হঠাৎই সহেলি আমার কবজি খামচে ধরল, ওই দ্যাখ, ওই দ্যাখ, ওরা এসেছে।

–কারা?

–মৈনাক আর চন্দ্রা।

সত্যি তো। এগজিবিশন হলের সামনে দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে যেন হাত-মুখ নেড়ে কথা বলছে মৈনাক। পরনে কাঁথাস্টিচের কারুকার্যময় তসর পাঞ্জাবি, আলিগড়ি পায়জামা। বেশ মোটা হয়ে গেছে মৈনাক,, চুল কমে এসেছে, মধ্য প্রদেশ স্ফীত, তবু চিনতে অসুবিধে হয় না। মানুষের বাইরেরটা আর কতটুকুই বা বদলায়। মৈনাকের পাশেই পরনে ঢাকাই শাড়ি, পায়ে হাইহিল। ওই মহিলাই কি চন্দ্রা দেবী? বেশতো বয়স। মৈনাকের বড় বৈ ছোট তো নয়!

এসকালেটার থেকে নেমে সহেলিকে বললাম, পাত্তা দিস না। সোজা ভেতরে ঢুকে যাই চল। সহেলি মুখ বেঁকাল– আমার বয়েই গেছে পাত্তা দিতে। হু, কেয়ার'স দ্যাট বিচ!

বলল বটে, তবে হাঁটার গতি যেন একটু মন্থর হয়ে গেছে। সহেলিকে প্রায় টেনে নিয়ে অডিটোরিয়ামে ঢুকে গেলাম।

মঞ্চে হাসির নাটক চলছে। কলকাতারই দল। নায়ক-নায়িকা নামজাদা ফিল্মস্টার। খুব ভিড় হয়েছে আজ, গোটা জায়গাটা কানায় কানায় ভর্তি। ক্ষণে ক্ষণে হাস্যরোল, ঘন ঘন হাততালি, দারুণ জমে গেছে নাটকটা। চেয়ার না পেয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে গেলাম। দেখা নাটক, তবুও সংলাপের কারিকুরিতে হেসে উঠছি মাঝে মাঝে। হঠাৎ নজরে পড়ল সহেলির মুখে হাসির চিহ্ন মাত্র নেই। তাকিয়ে আছে স্টেজের দিকে, কিন্তু কিছু দেখছেও না, শুনছেও না।

চাপা স্বরে জিজ্ঞেস করলাম, কী রে, কী ভাবছিস?

সহেলি হিসহিস করে উঠল, তার কী দু'কান কাটা। হায়া-শরমের বালাই নেই, নাচতে নাচতে জোরে চলে এসেছে।

-তাতে তুই আপসেট হচ্ছিস কেন? তুই তো কাল বলছিলি মৈনাক আসতে পারে।

–বলেছিলাম, কিন্তু... মৈনাকের এখন এটুকু বোধও নেই, ওকে আজকাল কেউ পছন্দ করে না? মানসমম্মান সবকি খুইয়ে বসে আছে? জানে না সবাই ওদের নিয়ে হাসাহাসি করে?

–তাতেই বা তোর কী?

–ওদের মানে না লাগতে পারে, আমার লাগে। সবাই তো আমার দিকেও তাকাবে। মজা পাবে। আর পিঠ চাপড়ানোর নাম করে হুল ফুটিয়ে বলে যাবে ওই ডিবচটাকে তুমি সহ্য করতে কী করে! আরও আগেই তোমার শক্ত হওয়া উচিত ছিল সহেলি।

–বলুক গে, গায়ে মাখিস না।

সহেলি তবু ফুসতে লাগল। নাক ফুলছে, চোখ জ্বলছে। আমারও বিশ্রী লাগছিল। চোখের চামড়া বস্তুটা কি একেবারেই লোপ পেয়েছে মৈনাকের? এমন একটা জমায়েতে রক্ষিতাকে বগলাদাবা করে চলে এল? অবশ্য কে কাকে রেখেছে বলা মুশকিল।

উদ্যোক্তাদের একজন দেখতে পেয়েছে আমাকে। এগিয়ে এসেছে, কী খবর কাবেরীদি, কোথায় ছিলেন?

নিজেকে স্থিত করে মুখে হাসি ফোটালাম, এই তো... আপনাদের শহরটা একটু দেখছিলাম।

–আপনাকে সুবীরদা অনেকক্ষণ ধরে খুঁজছেন।

সুবীরদা মানে সুবীর হালদার। বিখ্যাত কবি। সুবীরদার বেশ কয়েকটা কবিতা আমি আবৃত্তি করি। এক ধরনের চার্ম আছে কবিতাগুলোয়, শ্রোতাদের সরাসরি বিদ্ধ করে। আবৃত্তির সূত্রেই। সুবীরদার সঙ্গে মোটামুটি সৌহাদ্যের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে আমার। জিজ্ঞস করলাম– কোথায় সুবীরদা?

–ওই তো, এগজিবিশন রুমে। বুকস্টলে বসে আছেন।

সহেলিকে বললাম –দাঁড়া একবার দর্শন দিয়ে আসি।

সুবীরদাকে অবশ্য বুকস্টলে পাওয়া গেল না। বেশ কয়েকজন মহিলাভক্ত পরিবৃত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক শাড়ির

দোকানের সামনে। আমাকে দেখতে পেয়েই হৈহৈ করে উঠল, কী ব্যাপার তোমার? আমাকে এমন বিপাকে ফেলে দিচ্ছ কেন?
–কেন, কী করলাম?
–আমার ওপর ভরসা করে প্রতীক তোমায় ছেড়ে দিল। বারবার করে বলে দিয়েছিল, আমার বউটাকে একটু দেখবেন দাদা, বিদেশবিভুঁই-এ হারিয়ে না যায়...। আর তুমি আমায় ডজ মেরে নিপাত্তা হয়ে গেলে?
–ধ্যাৎ, নিপাত্তা হব কেন? এক বন্ধুর বাড়িতে আছি।
–হ্যাঁ, শুনলাম। কাল সন্ধ্যেবেলা তোমায় একজন ইলোপ করে নিয়ে গেছে। সুবীরদার কথা বলার ধরনটাই এরকম। হাসতে হাসতে বললাম,–দেখছেন তো, সশরীরে বর্তমান। বলুন, কী আজ্ঞা?
–পরশুতো নিউ জার্সির ফ্লাইট, মাঝেতো মাত্র একটা দিন, কী করছ কাল?
–দেখি।... মানে এখনও...।
–হেলেন যাবে?
–কোথায়?
–হেলেন। হেলেন। ড্যান্সার নয়, বিচ। মানে সি বিচ। কাল ভোরে স্টার্ট করে রাতে ফিরে আসব। জাস্ট ডে স্পেন্ট।
খেয়াল করি নি, পাশে ক্যাসেটের স্টলে মৌনমুখর দাঁড়িয়ে। ভারী সুন্দর রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইছে আজকাল মৌন। বেশকিছু ক্যাসেট বেরিয়ে গেছে। ছেলেটির ব্যবহারটিও মধুর, কথাবার্তায় এতটুকু চালবাজি নেই।
মৌন মুখর হল, –চলুন না কাবেরীদি। আমরা একসঙ্গে যে কজন এসেছি, সবাই যাচ্ছি। রথীনবাবু দু'টো গাড়ির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।
সুবীরদার স্বর ফের গমগামিয়ে উঠল।
-এতো করে বলার কী আছে, কাবেরী নিশ্চয়ই যাবে। ওকে ছেড়ে গেলে প্রতীক আমায় আস্ত রাখবে?
বটেই তো, বটেই তো। সুবীর হালদার সঙ্গে থাকলে সব মহিলার স্বামীই নিশ্চিন্ত। ক্রমাগত আদিরসাত্মক জোকস শোনাবে, বোতল সেবন করে বেহেড হয়ে যাবে...! মাঠে কি কবিমহলে সুবীর হালদারের নাম আলুসুবীর। পেশাদারি সম্পর্ক যেমনই থাক, এসব মানুষের সঙ্গে দূরত্ব একটু রাখতেই হয়।
মুখটা কাঁদো কাঁদো করে বললাম, আমায় ছেড়ে দিন সুবীরদা। আমার বন্ধু কাল আমায় নিয়ে বেড়াবে বলে অফিস থেকে ছুটি নিয়ে রেখেছে।
–অ। তা মেয়ে বন্ধুর সঙ্গে ঘুরে আনন্দ পাবে?
–কী করি বলুন! এত করে বলছে... একদম সেই ছোটবেলাকার বন্ধু...
–বেশ। ধুতি-পাঞ্জাবি পরা সুবীরদা আমেরিকান কায়দায় কাঁধ ঝাঁকাল। পকেট থেকে একটা নস্যির ডিবে বের করে নস্যি ঠুকছে নাকে। মুখ-চোখ লাল করে ভোম হয়ে রইল একটু। তারপর নাক টানতে টানতে বলল,–যা খুশি করো। এসেছ স্ট্যাচু অফ লিবারটির দেশে, তোমারতো এখন অখণ্ড স্বাধীনতা।
সুবীরদা চটেছে কি? প্রলেপ দেওয়ার জন্য প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে দিলাম,–আপনি আবার নস্যি ধরলেন কবে থেকে?
–করবটা কী? কোথাও যে সিগারেট খেতে পারছি না। কী খ্যাচাকলে যে পড়েছি! কমোডে বসে সুখটান দেব সে উপায়টাও নেই। হোটেল রুমে স্মোক ডিটেকটার লাগানো।
–তা পেলেন কোথায় নস্যি?
এখানকার ইন্ডিয়ান স্টোরে। সব পাওয়া যায় সেখানে। গুড়াকু পর্যন্ত। দু'চার মিনিট হাসিঠাট্টা করে ফিরছি সহেলির কাছে, তখনই হঠাৎ মৈনাকের মুখোমুখি। আমার সঙ্গেই কথা বলতে এসেছে মৈনাক। একাই।
গভীর পরিচিতের সুরে বলল,– কী খবর? কেমন আছ? তুমি তো এখন সেলিব্রেটি! এড়ানোর উপায় নেই।
দেঁতো হাসলাম।
–কেমন লাগছে আটলান্টা?
–মন্দ কী!
–শুনলাম তুমি নাকি আমাদের বাড়িতে উঠেছ?
–তোমাদের বাড়ি? ব্যঙ্গ ফুটে উঠল গলায়,-তমি তো সেখানে থাকো না! একটুও থতমত খেল না মৈনাক,

অবলীলায় বলল,–থাকি না থাকি, বাড়িটা কিনেছিলাম তো আমিই।
–তাই কি? আমি তো অন্য কথা জানি। বাড়িটা লোনে কিনছিলে, বছর দেড়েক হল ইনস্টলমেন্ট দেওয়া বন্ধ করছ, গোটা দেনাটা সহেলি নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে, ও বাড়ি এখন সহেলির।
এবার নাড়া খেয়েছে মৈনাক। শ্লেষের সুরে বলল, –তোমার বন্ধু তো সব উগরে দিয়েছে দেখছি!
-তুমি কি ভেবেছিলে চেপে চেপে রাখবে? তোমার কীর্তির সুবাস গোটা মহাদেশেই ছড়িয়ে পড়েছে।
-একতরফা কথা শুনে ওপিনিয়ান তৈরি কোরো না কাবেরী।
-তোমারও বুঝি কিছু সাফাই আছে?
-অফকোর্স। এত বছর ঘর করেও কেন বিয়ে ভাঙে, কেন অন্য দিকে মন যায়, সেটা কখনও ভেবে দেখেছ? নিশ্চয়ই কোনও গ্যাপ তৈরি হয়েছিল।
-কিসের গ্যাপ? বউ ছেলে নিয়ে আমেরিকায় সেটল্ করবে বলে দেশ ছেড়ে চলে এলে, দু'জনে দিব্যি চাকরি-বাকরি করে গাড়ি বাড়ি করছিলে, তোমাদের অত সুন্দর একটা ছেলে.... কিসের অভাব ছিল তোমার?
-তুমি বুঝবে না।
-বোঝাও।
-টাকা-পয়সা ঘর-সংসার ছাড়াও পুরুষমানুষের আর একটা জিনিসের প্রয়োজন হয়। শী ল্যাকড ইন দ্যাট ডিপার্টমেন্ট। তোমার বন্ধুর মধ্যে সেই প্যাশান কোথায়? শী ইজ ফ্রিজিড।
অ্যাবসোলিউটলি ফ্রিজিড।
পলকের জন্য কাল রাতের ছবিটা মনে পড়ল। মৈনাকের বালিশ আঁকড়ে শুয়ে আছে সহেলি!
রুক্ষ গলায় বললাম, প্যাশান শব্দের অর্থ বোঝ? প্যাশান কাকে বলে জানো?
-কুল কুল। তুমি মিছিমিছি উত্তেজিত হয়ে পড়ছ। মৈনাক নির্বিকার হাসছে,- শোন। তোমরা, অ্যাভারেজ বাঙালি মেয়েরা, একটা জায়গায় বড় ভুল করে ফেলো। একটা সার্টেন বয়সের পরে হাজব্যান্ড তোমাদের কাছে ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট হয়ে যায়। কিম্বা বলতে পারো একটা গৃহপালিত পশু। তার ভেতরে যে আর্জটা আছে, সেটাকে তোমরা আর পাত্তা দিতে চাও না। ফরচুনেট্লি চন্দ্রা আমার সমস্যাটা ফিল করতে পেরেছে। ধরেছে আমার প্রবলেমটা কোথায়। অ্যান্ড নাউ আই অ্যাম স্যাটিসফায়েড উইথ হার। চারদিকে তাকিয়ে নিয়ে মৈনাক গলা ঝাড়ল,– জানো আমি নিজের সঙ্গে কত যুদ্ধ করেছি? সহেলি বুবুনকে ছেড়ে আসতে আমারও কম কষ্ট হয়নি! বাট আই কুড ন্ট হেল্প ইট। চন্দ্রা আমায় জিতে নিল। আমি সহেলির কাছ থেকে যা পেতাম না, চন্দ্রার কাছ থেকে সেটা পেয়েছি।
আর কথা বলার প্রবৃত্তি হচ্ছিল না। বললাম,– থাকো তুমি যাকে নিয়ে খুশি। আর কখনও দেখা হলে আমায় চেনার চেষ্টা কোরো না।
চলেই যাচ্ছিলাম, মৈনাক পিছন থেকে ডাকল,- শোন, তোমার বন্ধুকে বলে দিও ও ডিভোর্স স্যুট ফাইল না করলে আমিই কেস করতাম। আরও বলে দিও, সর্বত্র যেন আমার নামে এভাবে কেচ্ছা গেয়ে না বেড়ায়।
স্টলরুমের বাইরে পা রাখতে না রাখতেই সহেলি। প্রায় দৌড়ে এসেছে, কী বলছিল
মৈনাক?
-তুই দেখেছিস?
-তোকে খুঁজতে এসে চোখে পড়ল। আঙুল নেড়ে কী বোঝাচ্ছিল রে?
-ছাড় তো, যত সব ফালতু কথা।
-চন্দ্রার গুণকীর্তন করছিল বুঝি?
-ওই আর কি। চন্দ্র নাকি ওকে ফিল করে, তুই পারিসনি, এই সব। বাদ দে, বাদ দে। কবজি উল্টে ঘড়ি দেখলাম,- সওয়া সাতটা বাজে, ফিরবি না? বুবুনের ফোন আসবে তো।
সহেলি গুম হয়ে গেল। হাঁটছে হনহন। নীচতলা থেকে মাঝের তলা, মাঝের তলা তেকে ওপর তলা। লাউঞ্জে চেয়ার নিয়ে গোল হয়ে বসে আড্ডা মারছে একদল কিশোর-কিশোরী। বাঙালি মা-বাপেরই সন্তান, তবে বাংলা জানে না, জানলেও বলতে চায় না,কথা বলে অদ্ভুত নাকি সুরে, বিচিত্র আমেরিকান অ্যাকসেন্টে। বঙ্গ সম্মেলন নিয়ে এরা কণা মাত্র উৎসাহী নয়, ভুলেও বাংলা অনুষ্ঠান দেখে না, বাবা-মার উপরোধে স্রেফ দয়া করে পিতৃ

For More Books & Muzic Visit www.MurchOna.com

পুরুষের ক্ল্যানের সংখ্যা বাড়াতে এসেছে। ওই দঙ্গলেরই একটি মেয়ে সহেলিকে দেখে হাত নাড়ল,- হাই মাসশি, ক্যামোন আছো? হাউ ইজ বুবুন?
সহেলি ঘট করে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। পলকে বিস্ফোরিত হল। চোস্ত আমেরিকান ইংরিজিতে খোঁকিয়ে উঠল,- অ্যাই, বুবুনের সঙ্গে তোর কী? খবরদার যদি আমার ছেলের দিকে তাকাস। আর আমাকে মাসি বলে ডাকিস, তোর স্পর্ধা তো কম নয়? কুত্তির বাচ্চা কুত্তি, তোর নোংরা মা'টা কোন সুবাদে আমার বোন হয়, অ্যা?
সহেলির আকস্মিক আক্রমণে মেয়েটা হাউমাউ করে উঠতে যাচ্ছিল, সঙ্গে সঙ্গে ফের ধমক,- চুপ চুপ, একটাও কথা নয়। ভদ্রবাড়ির ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বসে আছিস কোন মুখে? যা যা, মা-মেয়ে গলা জড়িয়ে খদ্দের ধরগে যা।
বন্ধুদের সামনে অপমানের ঝাঁঝে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে মেয়েটা। ফ্যালফ্যাল তাকাচ্ছে। বাকি ছেলেমেয়েগুলো সহেলির রণরঙ্গিনী মূর্তি দেখে সন্ত্রস্ত।
মেঝেয় পা ঠুকছিল সহেলি, গরগর করছিল। আমি টানতে টানতে বাইরে নিয়ে এলাম সহেলিকে। রাস্তায় এসে বললাম,- তুই কি পাগল হয়ে গেলি? সহেলি নিরুত্তর।
-মেয়েটাকে ওভাবে বললি কেন? যেমনই হোক, ওর কী দোষ? মার ওপর ঝাল মেয়ের ওপর কেন ঝাড়বি? তা ছাড়া মেয়েটা কত ছোট....
সহেলি খপ করে আমার হাতটা চেপে ধরল। করুণ মুখে বলল, কেন ওরকম করলাম বল্ তো? সত্যি কি আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে?
-তাই তো মনে হচ্ছে। এত উত্তেজিত হবি কেন?
-ছি ছি ছি ছি! সহেলি অস্থিরভাবে মাথা ঝাঁকাচ্ছে, বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলোর সামনে.... বরুন সংঘমিত্রার ছেলেটা ছিল..... দেবলদার মেয়ে.... ওরা কী ভাবল আমার সম্পর্কে? গিয়ে নিশ্চয়ই বলবে বাড়িতে! এ আমি কী করলাম?
পিঠে হাত রাখলাম সহেলির। নরম গহলায় বলালাম,- শান্ত হ। আর কখনো পাবলিকলি মাথা গরম করিস না। এতে তো নিজেরই মানটা যায়, তাই না?
সহেলি কী বুঝল কে জানে, হাঁটছে ধীর পায়ে। টের পাচ্ছি একটা ঝড় চলছে ভেতরে। গাড়িতে ওঠা পর্যন্ত একটি কথাও বলল না। ড্রাইভিংসিটে বসে আছে নিশ্চল।
আবার স্মরণ করিয়ে দিলাম,- এই, স্টার্ট কর। বুবুনের ফোন আসবে যে। সহেলি, ঝুকে স্টিয়ারিং-এ মাথা রাখল। তারপরই ডুকরে উঠেছে কান্নায়– কেন ওরা মৈনাককে কেড়ে নিল? কেন কেন?

রাত্তিরে ভাল করে ঘুমোতে পারলাম না। ছেঁড়া ছেঁড়া ভাবনা পাক খাচ্ছিল মাথায়। সহেলিকে কেমন প্রহেলিকার মতো লাগছিল। মানুষের মন সত্যিই জটিল ধাঁধা। যে মৈনাক সহেলিকে লাথি মেরে চলে গেল তার জন্য এখনও কেন এত ছটফট করে সহেলি? নিজেই বিচ্ছেদের মামলা এনেছে, অথচ কিছুতেই মন থেকে ছাড়তে পারছে মৈনাককে। আমি হলে তো ওরকম বরের আর মুখদর্শন করতাম না। সহেলি কেন এত দুর্বল হয়ে পড়ছে? ভালবাসা? অপমানের পাঁকে একগলা ডুবে গেলেও ভালবাসা অবশিষ্ট থাকে? নাকি সহেলি নিজের হেরে যাওয়াটা মানতে পারছে না? পরাজয়ই বা কিসের? সহেলি তো যথেষ্ট মাথা উঁচু করে বেঁচে আছে!
চিন্তাগুলো মাথায় নিয়েই ভোরের দিকে বুঝি একটু ঘুম এসেছিল, জাগলাম সহেলির ডাকাডাকিতে, কী রে, তুই তো দেখি আমার থেকেও বেশি নাক ডাকাস। উঠবি না?
আড়মোড়া ভেঙে বললাম, কটা বাজে?
-পৌনে নটা। চল, স্নান সেরে নে। গরম কাপ মাথার কাছে নামিয়ে রাখল সহেলি,- চায়ে চুমুক দিতে দিতে তোর ইমেলটাও চেক করে নিস্।
নেই। কোন বৈদ্যুতিক বার্তা নেই আমার জন্য। বুকটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকল। কালও আসেনি। নিয়মিত মেল করবে বলে কথা দিয়েছিল, বেমালুম ভুলে গেল বাপ-মেয়ে? একেই কি বলে চোখের আড়াল হলে মনের আড়াল হয়ে যাওয়া?
মন খারাপ কোলে করে বসে থাকার জো নেই, অনবরত তাড়া লাগাচ্ছে সহেলি। এখন সে আবার আগের

মতোই স্বচ্ছন্দ, স্বাভাবিক, উচ্ছল। গলা ছেড়ে গান গাইতে গাইতে ব্রেকফাস্ট বানাল। জিন্‌স আর টি-শার্ট পরে ঝটপট তৈরি। গ্যারেজ থেকে গাড়ি বার করে প্যাঁ পোঁ হর্ন বাজাচ্ছে। একটা অফিসের দিন ছুটি নিয়েছে, আধখানা মুহূর্তও আজ সে হেলায় হারাতে রাজি নয়।

মার্টিন লুথার কিং-এর সমাধি ঘুরিয়ে সহেলি আমায় নিয়ে গেল কোকাকোলা মিউজিয়ামে। যতই জগঝম্প এলাহি ব্যাপার হোক না কেন, কারখানা দেখতে কতক্ষণ আর ভাল লাগে। তবে বিনি পয়সায় নানান স্বদের পানীয় চাখা গেল ওটুকুই যা লাভ। তারপর স্টোন মাউন্টেন দেখে দ্বিপ্রাহরিক আহার। শীতল চিনে রেস্তরাঁয় বড় বড় কাঁকড়া ভাজা আর চিংড়ি ভাজা সহযোগে বাফে লান্‌চ। অহো কি সুখাদ্য! খেয়ে যখন বেরোলাম, পেট একদম টইটুম্বর।

এরপর আর ছোটাছুটির ইচ্ছে ছিল না। এসি গাড়িতে বসে টের পাওয়া যায় না বটে, তবে আজ গরম পড়েছে। জব্বর। আমেরিকার আবহে নিকাদ বিহারী হলকা। স্টোন মাউন্টেনে মাত্র আধঘন্টা মতন ছিলাম, পাহাড়ের গায়ে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের স্মারক কি দেখব, রোদ্দুরে গা, হাত-পা পুড়ে যাওয়ার জোগাড়।

কিন্তু সহেলি আজ শেষ না দেখিয়ে ছাড়বে না। গাড়ি হাকিয়ে চলল লেক লেনিয়ার। পথে পাবালিক্স থেকে ঢাউস একখানা লেমোনেডের বোতল কিনে নিয়েছে, চুমুক দিতে দিতে ছুটছি দুই সখী। ধুলোবিহনী মসৃণ চওড়া চওড়া রাজপথ বেয়ে। শৃংখলা পরায়ণ গাড়ির স্রোতের সঙ্গী হয়ে।

লেক লেনিয়ার দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। সুবজের মাঝে প্রকাণ্ড এক জলাশয় এঁকেবেঁকে গুলিয়ে পেঁচিয়ে কত দিকে যে ছড়ানো। মাঝে মাঝে দ্বীপও আছে, গাছপালায় ছাওয়া। জলের বুকে কোথও চলছে উদ্দাম ওয়াটার স্কিয়িং, কোথাও বাচ্চারা হুল্লোড় করছে কোমর সামান জলে, কোনও ঘাটে কালো সাদা সাহেব-মেমের স্নানের উল্লাস।

নির্জনতা খুঁজে একেবারে জলের কিনারে গিয়ে বসলাম আমরা। মেপলগাছের ছায়ায়। ঘাসে পা ছড়িয়ে দিল সহেলি। বলল, চাইলে গড়িয়েও নিতে পারিস।

-বসে থাকতেই ভাল লাগছে। কি সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে রে এদিকটায়।

-হুম।

নিশ্চুপ হয়ে উপভোগ করছি শান্ত নিস্তব্ধতা। হঠাৎ একটা পাখির ডাক শুনতে পেলাম। চেনা চেনা। অনেকটা যেন ফিঙে পাখির ধরন। মাথা তুলে মেপলপাতার ফাঁকে ফাঁকে খুঁজলাম পাখিটাকে। দেখতে না পেয়ে আবার চোখ রেখেছি জলে। হাসের দল চড়ে বেড়াচ্ছে আপন মনে। ছোট ছোট ঢেউ তিরতির ছুঁয়ে যাচ্ছে পাড়। দুলছে। মায়াবী হ্রদে জলের কাঁপন ক্রমশ আবিষ্ট করে দিচ্ছিল আমাকে। এই মুহূর্তে মনেই পড়ে না সেই কোন সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর ওপারে এক দুঃখী ঘিঞ্জি শহরে আমার বাস।

ঘোর ছিঁড়ে গেল সহসা। বিকট আওয়াজ তুলে জল ছেতরে ছুটছে ওয়াটার স্কিয়ার। স্কি শুদ্ধু পাক খেল শূন্যে। আস্ত একখানা সামার সন্ট দিয়ে আবার চিরছে জলতল। চোখ কুঁচকে বললাম, ইশ, কী ডেঞ্জারাস খেলা! মানুষ এসব খেলায় কি সুখ পায়? সহেলি উদাসীনভাবে বলল, যার যাতে আনন্দ।

-একটু বেখেয়াল হলেই তো হাড়গোড় ভেঙ্গে দ হয়ে পড়ে থাকবে। কত লোক তো শুনেছি এই করতে গিয়ে মারাও যায়।

- ওই স্কি করণেওয়ালার কি সে খবর রাখে না? খুব রাখে। তবু জেনে-শুনেও তো খেলছে। উত্তেজনা ছাড়া মানুষ বোধ হয় থাকতেই পারে না। সহেলি আমার দিকে ফিরল, মৈনাকের কথাই ধর। ও কি এতই নির্বোধ, যে বোঝে না চন্দ্রার সঙ্গে খেলাটার পরিণতি কি? নিষিদ্ধ পুলকের চার্ম কদিন থাকবে? তারপর? তারপর তো পাখি ফুড় ৎ। অন্য কোন ডালে বসে লেজ নাচাবে। অফকোর্স আসল গাছটাকে না ছেড়ে। তখন মৈনকের কী দশাটা হবে ভাব তুই। আরও বেশি মদ খাবে। আরও বেশি নিজেকে ধ্বংস করবে, তাই তো?

কথাটা হয়তো ভুল নয়। তবু চোখ পাকালাম, মৈনাকের ভবিষ্যৎ না ভেবে তোর কি ঘুম হচ্ছে না? ওই বজ্জাতটার শোকে তুই আবার কেঁদে ফেলবি মনে হচ্ছে?

শুধু মৈনাক নয় রে নিজের কথাও ভাবছি। দিব্যি সংসারটা ছিল.... বয়স তো আমাদের কারুর থেমে থাকছে না, আস্তে আস্তে বুড়োই হচ্ছি... ভেবেছিলাম আমরা পরস্পর পাশাপাশি বেঁচে থাকতে পারব। তাও তো হল না। একটা সেট ফিউচার ছিল, সেই ছকটাই উল্টে গেল। মৈনাক তো একা হয়ে যাবেই, কিন্তু আমি? আমরও

তো একই ফিউচার, একই ডেসটিনি। এ দেশটার সব ভাল। আড়ম্বর আছে, সুখ-সুবিধের অন্ত নেই, কিন্তু এখানে একা থাকা যে কী ভয়ংকর।
অত ভাবছিস কেন? তোর তো বুবন আছে।
-ছেলে মানুষের মতো কথা বলিস না। বুবুন আমায় প্রচণ্ড ভালবাসে, সে আমার জন্য ওরিড, আমায় আগলে রাখার চেষ্টা করছে, সব সত্যি। কিন্তু সেও তো একটু একটু করে নিজের বৃত্তে ঢুকে পড়বে। ঢুকতেই হবে। মার কথা ভেবে তার জীবনে কোনও সাধ-আহলাদ থাকবে না, উইক এন্ড এনজয় করবে না, ডেটিং করবে না, তার জীবনে গার্লফ্রেন্ড আসবে না, সে নিজের সংসার বসাবে না, এ নিশ্চয়ই আমি আশা করতে পারি না। আমিই বা অত স্বার্থপর হব কেন? হতে চাইলেও বা বুবুন কেন তা মানবে? কদিন পরে হয়তো এই সাড়ে আটটা থেকে নটার মধ্যে ফোন করাটা ওর কাছে একটা বোরিং রিচুয়াল হয়ে দাঁড়াবে। আমার যতই খারাপ লাগুক, যতই অস্থির হই, এসব তো আমায় মানতেই হবে। সুতরাং...
সহেলি প্রকাণ্ড বড় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। আর কিছু বলছে না। সহেলির চুপ করে থাকাটা আমার অসহ্য লাগছিল। জিজ্ঞেস করলাম, সুতরাং কি? পরিণতি সেই একই। প্রায় মৈনাকের মতো। একা বেঁচে থাকা। একদিন একা একাই মরে পচে হেজে যাওয়া। সহেলি বিষণ্ন হাসল, তুই হয়তো ভাবছিস আমি এই অছিলায় আবার মৈনাকের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে নিয়ে এক সঙ্গে থাকার কথা ভাববো। উহু আমাদের সম্পর্ক আর জোড়া লাগবে না। তবে আয়রনিটা হল, ডেঞ্জার গেম না খেলেও আমাকে হাড়গোড় ভেঙ্গে দ হয়ে যেতে হবে। সত্যিই তো, এ যেন হেড ইউ উইন, টেল আই রুজ। সহেলির ভবিষ্যতে সত্যি তো কোনও আলোর রেখা নেই। মৈনাক অত কাণ্ডর পরও যেভাবে ওর মনটাকে দখল করে আছে, নতুন কোনও সঙ্গী খুঁজে নিয়ে নিজেকে স্থির করাও সহেলির পক্ষে আর বোধহয় সম্ভব নয়।
সহেলির কাঁধে হাত রাখলাম, –এক কাজ কর না। এখানকার পাততাড়ি গুটিয়ে দেশে ফিরে চল।
–তাহলেই প্রবলেম সল্‌ভড?
–অন্তত বিদেশে একা একা তো পচতে হবে না।
–হ্যাঁ, আমারও মাঝে মাঝে চিন্তাটা আসে। আর বছর কয়েকের মধ্যে বুবুন দাঁড়িয়ে যাবে, তখন তো আমি ব্যাক টু প্যাভেলিয়ন হতেই পারি। ছেলে এখানে রইল... বুবুন এখানকার পরিবেশে রপ্ত হয়ে গেছে, ওখানে ওকে টেনে নিয়ে গেলেও ওর ওপর ইনজাস্টিস করা হবে... আমিই না হয় মাঝে মাঝে ওকে এসে দেখে যাব। কিন্তু এই প্ল্যানটাতেও তো স্বস্তি পাই না।
–কেন?
–দেশে কোথায় ফিরব? কার কাছে? শ্বশুরবাড়ির কথা বাদ দে, ওই ফ্যাক্টরটা তো বাতিলই হয়ে গেছে।
–কেন, তোর দেওর-ননদরা যোগাযোগ রাখে না?
–কচিত কখনও মেল কের। বিজয়ায়। নিউ ইয়ারে।
–মৈনাকের কীর্তির কথা তাদের জানিয়েছিস?
–সব জেনেছে। প্রথম প্রথম বেলেল্লাপনার কথা শুনে নিয়মমাফিক একটু হা-হুঁতাশ করেছিল, এখন তাদের তেমন মাথাব্যথা নেই। মৈনাকের বাবা-মা তো ছেলের কাছ থেকে ডলার পেয়েই খুশি। আর দেওর-ননদের ভাবটা এমন, তোমরা বিদেশে গিয়ে কে কী করছ না করছ তোমরা বোঝ, আমরা বেশি নাক গলিয়ে কী করব! ইনফ্যাক্ট, এবার বুবুনের জন্মদিনে ওরা তো উইশ করতেও ভুলে গেছে।
–ওদের গুলি মার। ওরা তো আর তোর ইন্‌-ল'ও থাকছে না। তুই নিজের ফ্যামিলির সঙ্গে থাকবি।
–হুহ, নিজের ফ্যামিলি! হাসালি। দাদরা বউদিরা আছে ঠিকই, দিদিজামাই বাবুও আছে, কিন্তু তাদেরও তো নিজস্ব জগত আছে, ঘরসংসার আছে, সেখানে আমি গিয়ে গুঁতো মেরে কতটা ঢুকতে পারব? যদিও দাদা বউদিরা সব সময়েই ডাকছে। দিদিও বলছে, আর থাকিস না ওখানে, চলে আয়, চলে আয়... তবু ভরসা পাই না।
–মাসিমাও তো আছেন এখনও। মাসিমাকে নিয়ে থাকবি।
–মা'ই বা আর ক'দিন? তাছাড়া, এমনিই তো মা আমায় নিয়ে সারাক্ষণ দুঃশ্চিন্তা করছে, যখনই ফোনে কথা বলে, দুটো কথা বলার পর গলা বুজে যায়... চোখের সামনে থাকলে আরও তো কষ্ট বাড়বে। না রে, দেশে

ফেরাও আমার আর হবে না। সহেলি জোর করে হেসে উঠল, এখানেই ঠিক আছি। চাকরি-বাকরি করছি, বাড়িঘরও হয়েছে, বুবুনও রয়েছে...। দেশের জন্য মন কেমন করলে মাঝে মাঝে যাব। ঘুরে আসব।
ছোট ছোট কয়েকটা ছেলেমেয়ে খেলতে খেলতে এদিকে চলে এসেছে। একটা ছেলের হাত থেকে প্লাস্টিকের বল ছিটকে গিয়ে পড়ে গেল পানিতে। ছেলেটা ওমনি তরতর পানিতে নেমে গেছে, ধরার চেষ্টা করছে বলটাকে। গোড়ালি পানিতে নামল... হাঁটু পানিতে... কোমর পানি...।
হাওয়ার তাড়া খেয়ে বল ভেসে চলেছে আরও দূরে, আরও গভীর পানি।
এগোচ্ছে ছেলেটাও। কাণ্ড দ্যাখো, ডুবে যাবে যে!
কথা ভুলে আমরা কাঁটা। দেখছি বাচ্চাটার কাণ্ডকারখানা। অবশ্য বিপদ কিছু ঘটল না, লম্বা-চওড়া কৃষ্ণকায়া শিক্ষিকা ধমকে ডেকে নিয়েছে ছেলেটাকে। বল পানিতে ভাসতে থাকল আপন মনে, বাচ্চাগুলো অন্যদিকে চলে গেল।
দিনের তেজ মরে আসছে। আমরাও উঠলাম। হাঁটছি ঘাসের গাল্‌চে মাড়িয়ে। টুপটাপ পাতা খসছে গাছ থেকে, দেখছি শুকনো পাতার উড়াউড়ি।
গাড়ির দিকে যেতে যেতে সহেলি আবার চনমনে। এক শ্বেতকায় বৃদ্ধ সান্ধ্যভ্রমণে বেরিয়েছেন, জড়তাহীন ভঙ্গিতে তার দিকে হাত তুলল, হাই! হাউ ইজ লাইফ?
–ও ফাইন। সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোকের সহাস্য জবাব, ইজ নট ইট এ নাইস ডে?
–ইয়াপ্‌।
গাড়িতে বসে বললাম, আছিস বেশ। চেনা নেই, শোনা নেই, যাকে তাকে হাই হুই করছিস!
–এ দেশে এটারই চল। সহেলি গাড়ি স্টার্ট করতে করতে হাসল, –একদম অচেনা লোকও স্বচ্ছন্দে তোর সঙ্গে কুশল বিনিময় করবে। কেন বল্‌ তো?
–কেন?
–কারণ, সম্পর্কটা ওখানেই শুরু, ওখানেই শেষ। এখানে কোনও সম্পর্কেরই তো শিকড় গজায় না, তাই ওই ফরমাল ঠাটবাটটুকু থাকে।
কথাটা বাজল বুকে। সহেলির মধ্যেও শিকড়হীনতার যন্ত্রণাটা যেন ঢুকে পড়েছে। কিম্বা হয়তো নিজেকে শিকড়হীন করে উপড়ে ফেলতে চাইছে যন্ত্রণাটাকে। ভাবলেই বুকটা টনটন করে ওঠে। মেয়েটা সব অর্থে বিচ্ছিন্ন হয়ে কী করে যে বেঁচে থাকবে? সত্যি, কোথায় ছিল মেয়েটা, কোথায় এসে পড়েছে! কোথায় সেই ভবানীপুরের খিঞ্জি গলি, কোথায় এই আটলান্টা! এখানে রাস্তায় মানুষ হাঁটে না বড় একটা, এখনও অবধি একটাও স্ট্রিটডগ চোখে পড়েনি, বৈভব এখানে বিশালত্বের এক প্রসারিত গাম্ভীর্য নিয়ে বিরাজমান...। সহেলিটা শেষ পর্যন্ত এখানেই ডুবে গেল?
নিপুণ ভঙ্গিতে একটা বড় বাঁক পেরিয়ে সহেলি জিজ্ঞেস করল, কী রে, কী ভাবছিস?
ছোট শ্বাস ফেললাম,
–কিছু না।
–রাতে কী খাবি আজ? অদ্যই তো শেষ রজনী, ইটালিয়ান ডিনার হয়ে যাক।
–না না, বাইরে খেতে হবে না। ফ্রিজে অনেক রান্না আছে।
–ওকে। তাড়াতাড়ি খেয়ে শুয়ে পড় আজ, জম্পেশ করে একটা ঘুম দিয়ে নে। কাল তো আবার তোর সকালেই ফ্লাইট।
–হ্যা, গিয়ে তাড়াতাড়ি আগে গোছগাছটা সেরে ফেলতে হবে। সোজা বাড়ি চল্‌। সোজা অবশ্য ফেরা হল না। পথে জোর করে একটা পাবলিক্সে ঢুকল সহেলি, ইয়া বড় এক ব্রকোলি কিনল। আমায় ব্রকোলিভাজা খাওয়াবে। ক্রসো নিল খান কয়েক। আমার ভোরের পানি খাবার।
বাড়ি ঢুকে দেখি ভয়েস রেকর্ডারের আলো পিপ পিপ করছে। সহেলি একটু অবাকই হল, বুবুন আজ এত তাড়াতাড়ি ফোন করল যে? সবে তো আটটা দশ।
সোফায় শরীর ছেড়ে দিয়েছিলাম। অলস মেজাজে বললাম, –দ্যাখ, অন্য কেউও হয়তো মেসেজ রাখতে পারে। অন্য কেউ মানে কি মৈনাক! এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। রেকর্ডার চালু হতেই পলকে স্নায়ু টানটান।

কড়া গলায় মৈনাক ধমকাচ্ছে, ভেবেছ কী তুমি, অ্যাঁ? ছোটলোকোমির একটা সীমা থাকা উচিত।... এত বড় সাহস তোর, লিসাকে তুই অপমান করিস? চন্দ্রাকে হিংসে করে তোর কোনও লাভ হবে না, বুঝলি?... শোন্ মাগী, তুই আমার চন্দ্রার পায়ের নখের যুগ্যিও নোস।... আরও একটা কথা শুনে রাখ। তোর মতো ঘ্যানঘ্যানে মেয়ে ছেলেকে আমি কোনও দিনই ভালবাসিনি। অ্যাদ্দিন যে তোকে সহ্য করে ঘর করেছি এটা তোর চোদ্দপুরুষের কপাল। তুই আর তোর ছেলে, তোরা দুটোই আমার চোখে নোংরা আবর্জনা। বুঝেছিস? কথাটা তোর ছেলের মাথাতেও ঢুকিয়ে দিস। সে যেন ভুলেও কখনও আমার সঙ্গে রিলেশন তৈরি করার চেষ্টা না করে। মনে থাকবে?

সহেলির মুখ সাদা হয়ে গেছে। কথাগুলো যেন রাশি রাশি জোঁক হয়ে রক্ত শুষে নিয়েছে সহেলির মুখ থেকে। ধপ করে বসে পড়ল সোফায়। কাঁপতে কাঁপতে বলল, –দেখেছিস তো? শুনলি?

রেকর্ডারটা চলছে। গা শিরশির করা যান্ত্রিক শব্দ। উঠে গিয়ে বোতাম টিপে বন্ধ করলাম। দাঁত কিড়মিড় করে বললাম –বাস্ট্রার্ড। একটা আদ্যন্ত মুখোশধারী খচ্চর।

সহেলি দু'দিকে মাথা নাড়ছে অস্থির ভাবে। অস্ফুটে বলল, আমি ফিরে যাব। চলে যাব। আমি বাড়ি চলে যাব। আর থাকব না আটলান্টায়।

সহেলি আমায় এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিতে এসেছে। এখান থেকে আর বাড়ি ফিরবে না, অফিস চলে যাবে। আজ থেকে আবার তার কেজো দিনের শুরু। স্যুটকেস দুটো ট্রলিতে চাপিয়ে সহেলিই ঠেলছে, আমায় হাত লাগাতে দিচ্ছে না। লাউঞ্জে ঢুকতেই সুবীরদার গাঁক গাঁক গলা, এই যে কাবেরী...। তুমি তো ডেঞ্জারাস। আর একটু দেরি করলে আমাদের প্লেন ফেল হয়ে যেত।

লজ্জাই পেলাম। সঙ্গী-সাথীরা সকলেই এসে গেছে, মালপত্র চেক ইন না করে অপেক্ষা করছে আমার জন্য। মনে মনে একটু ভালও লাগল। আমাদের টিমের অনেকের সঙ্গেই আমার তেমন ঘনিষ্ঠতা নেই, কারুর কারুর সঙ্গে তো প্লেনেই প্রথম আলাপ, তবু একসঙ্গে আসার সুবাদে এক ধরনের সখ্য তৈরি হয়ে গেছে। এটুকুই তো মানুষ আশা করে।

হালকা গলায় বললাম, আমি তো লেট করিনি। ফ্লাইটের তো এখনও এক ঘন্টা বাকি।

–এক ঘন্টা আর কতটুকুনি সময়? এখান থেকে প্লেন কতটা রাস্তা খেয়াল আছে?

এতক্ষণ মাথায় ছিল না, স্মরণ করিয়ে দিতেই হৃৎকম্প। সিকিইরটি চেকিং-এর বেড়া টপকে দুস্তর পথ পাড়ি দিতে হবে। লম্বা এসকালেটর বেয়ে হু হু করে পাতাল প্রবেশ, সেখান থেকে ভূগর্ভস্থ ট্রেন ধরে নির্ধারিত স্টেশনে, আবার এসকালেটরে উত্থান, দীর্ঘ প্যাসেজ ধরে হাঁটা, নম্বর মিলিয়ে গেট খুঁজে বের করা...। আটলান্টা এয়ারপোর্টটার বিশালত্ব দেখলে সত্যিই বুক ধড়াস ধড়াস করে। সহেলি বলছিল এটাই নাকি এখন পৃথিবীর ব্যস্ততম বিমানবন্দর। হতেই পারে। আকাশে যা ঘুড়ির মতো প্লেন উড়ছে সর্বক্ষণ!

তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, চলুন চলুন, ঝটপট লাইনে দাঁড়িয়ে যাই।

শ্লথ গতিতে এগোচ্ছে লাইন। দৈত্যাকৃতি এক কৃষ্ণাকায় যুবতী কাউন্টার সামলাচ্ছে। বাজ পাখির চোখে পরীক্ষা করছে কাগজপত্র। প্রতিটি বিদেশীকে জরিপ করছে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে।

সহেলিও চলছে আমার পাশে পাশে। ভদ্রতা করে সুবীরদাকে জিজ্ঞেস করল, আপনাদের হেলেন দেখা কেমন হল?

–হেলেনের আর দর্শন পেলাম কই! সুবীরদা ফোঁস করে শ্বাস ফেলল, আপনি কাবেরীকে নিজের গুহায় পুরে রাখলেন, সেই দুঃখে হেলেনের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম।

সুবীরদার সামনে দেবার্চনা। কথকশিল্পী। লঘু ছন্দে বেজে উঠল, কেন ব্লক দিচ্ছেন সুবীরদা? আপনার পেট খারাপ হল বলেই তো ট্যুরটা ক্যানসেল হল।

অভিনেতা দীপাঞ্জন হাতে সানগ্লাস ঘোরাতে ঘোরাতে কূট কাটল, পেট খারাপের আর দোষ কী? খাঁটি জিনিস খাওয়ার অভ্যেস নেই, ওদিকে লোভে পড়ে ইয়া এক গ্লাস আমেকিরান ক্রিম মিল্ক খেয়ে ফেললেন...

হি হি হাসছে সবাই। সুবীরদাও। হাসতে হাসতে মালপত্র ওজন করাচ্ছে। লাগেজ চলে গেল কনভেয়ার বেল্ট বেয়ে। বোডিং পাস হাতে নিয়ে কাউন্টার থেকে সরে এলাম। সহেলির সঙ্গে দাঁড়িয়েছি একটু তফাতে।

সহেলির চোখ ছলছল করছে। হাত রাখলাম সহেলির কাঁধে, –তিনটে দিন খুব ভাল কাটলরে।
–কই আর। সহেলি শুকনো হাসল, –সারাক্ষণ তো তোকে খালি দুঃখের কাহিনীই শুনিয়ে গেলাম।
–ত্যাৎ, বাজে কথা বলিস না। মৃদু চাপ দিলাম সহেলির হাতে –কলকাতা কবে আসছিস?
–দেখি।
–এই তুই কিন্তু কাল বলেছিস এবার চলে আসবি।
–যাব তো, সব দিক আগে একটু সামলে-সুমলে নিই। বুবুনের পড়াশুনাটা আগে শেষ হোক।
–হ্যা, তার পরই আয়। এখানে তোর আর পড়ে থাকার কোনও মানেই হয় না।
–হুম,...। দেখি...
– কী তবে দেখি করছিস?
–বুঝিসই তো বুবুনের পড়াশুনোর কী হিউজ খরচ। সহেলি ঢোক গিলল, –এর সঙ্গে বাড়ির ইনস্টলমেন্ট, গাড়ির লোন সবই তো চালাতে হচ্ছে।
–তো?
–হাতে কিছু পয়সাকড়ি না জমিয়ে কী করে যাই বল্?
–তাহলে আর তোর যাওয়া হয়েছে। ছেলের পড়া শেষ হবে, ছেলে দাঁড়াবে, তারপর তুই টাকা জমাবি... তদ্দিনে বুড়ি হয়ে যাবি।
সহেলি কোনও প্রতিবাদ করল না। আমার হাতের ওপর হাত রেখেছে। একটুক্ষণ মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে চোখ নামিয়ে নিল। ভিজে গলায় বলল, –সন্ধ্যাবেলা একটা ফোন করিস নিউজার্সি থেকে।
মৌনমুখর ডাকছে চেঁচিয়ে, –কাবেরী দি, আসুন।
সিকিউরিটি চেকিং-এর জন্য চলেছি দল বেঁধে। বাঁক নেয়ার আগে ঘুরে তাকালাম। পিছন পানে। সহেলি দাঁড়িয়ে। ডালপালাহীন নিস্পত্র গাছেল মতো। একা। হাত নাড়ছে।
বুকটা চিনচিন করে উঠল। বুঝতে পারছি সহেলি ফিরবে না। অন্তত মৈনাক যত দিন আটলান্টায় আছে।

For More Books & Muzic Visit www.MurchOna.com

suman_ahm@yahoo.com